মননের মুকুর

মাতৃভাব বিকাশে স্বামী ভূতেশানন্দ

অজয় কুমার ভট্টাচার্য

মাতৃভাব বললেই আমাদের মনে যে-ছবিটি ফুটে ওঠে তা অবশ্যই এক মাতৃমূর্তি, যাঁর দেশ-কাল ভেদে পোশাকের বিভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু মাতৃময়তায় তিনি অনবদ্য। সন্তানধারণ ও পালনী শক্তির অধিকারিণী হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই মাতৃভাব নারীর এক চিরন্তন ভূষণ। মাতৃভাব মানে শুধু স্নেহ-করুণার প্রকাশ নয়। সন্তানের কাছে 'মা' মানে একটি নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়, তাই মাতৃভাব মানে স্নেহ-করুণা সমন্বিত এক নিশ্চিন্ত, নিরাপত্তার আশ্বাস। এটি গৃহিণীদের চিরন্তন গুণ, আর হয়তো এই কারণেই বলা আছে 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।' গৃহ বলতে যে আমরা একটা নিশ্চিন্ত ও নিরাপত্তার আশ্রয় মনে করি তা মুখ্যত গৃহিণীনির্ভর। গৃহকে গৃহবাসীর কাছে আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক করে তোলার জন্য তিনি প্রাণপাতে প্রস্তুত থাকেন। আসক্তি বা প্রকৃতিজাত যে-নামেই তাকে ডাকা হোক না কেন, এটি সেই মাতৃভাবেরই প্রকাশ। আসক্তি বলে তাকে হেয়জ্ঞান করার কিছু নেই, কারণ এই স্বাভাবিক বৃত্তিই সুপ্রযুক্ত হলে সংসারে ঈশ্বর এসে বসেন ও তাকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তোলেন। এই লৌকিক মাতৃভাব অলৌকিক কী করে হয়ে ওঠে সেটি দেখানোর জন্যেই শ্রীমা এক অদ্ভুতুড়ে সংসারে সকলকে নিয়ে চলে মাতৃভাবের এক আদর্শ দেখিয়ে গেছেন যা অনুপম। তিনি এই জগৎসংসারের গৃহিণী, তাঁকে ভাবলে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত কোল সমন্বিত এক গৃহের আশ্বাস তিনিই দিয়ে গেছেন : "আমি মা থাকতে ভয় কি বাবা। সবসময় ভাববে যে আমার

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের স্বনামধন্য লেখক

একজন মা আছেন।” শুধু তাঁকে ও তাঁর কথা ভাবতে হবে, তাহলে তাঁর চিরন্তন নিশ্চিন্ততায় আমাদের ঠাঁই হবে।

এই মাতৃভাব নারীশরীরে স্বাভাবিক হলেও পুরুষশরীরেও অংশত থাকে। তবে প্রকৃতিজাত সেই মাতৃভাব নির্দিষ্ট একটি বা দুটি দেহের ওপরই আবদ্ধ থাকে। বিরল কিছু নারী বা পুরুষশরীরে তা শরীরবিশেষে আবদ্ধ না থেকে সর্বভূতের প্রতি প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এ-মাতৃভাবের উৎস আধ্যাত্মিকতায় যা ঈশ্বরপ্রেমকে মানবপ্রেমে পরিণত করে। গীতার মতে যাঁরা ব্রহ্মবিজ্ঞানী তাঁদের সকলের মধ্যেই সমদৃষ্টি ও উদারতার প্রকাশ ঘটে, কিন্তু সে-সমদৃষ্টি সকলের প্রতি মাতৃভাব হয়ে প্রকাশ পায় না। ঈশ্বরচিহ্নিত বিশেষ কোনও কোনও ব্যক্তি এটি লাভ করেন এবং স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে গড়া এক নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়ান। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বাদশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজী এই গোত্রের মহাপুরুষ ছিলেন। তবে তাঁর এই মাতৃভাব রামকৃষ্ণ ভাবধারায় কোনও ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। এই গুণটি তিনি পরম্পরাক্রমেই পেয়েছিলেন, যার শুরু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত ভাবসাধনের পর মাতৃভাব নিয়ে ছিলেন। এটি দ্বিমুখী। জগদম্বার কাছে মাতৃভাবে তিনি বালক, আবার ভক্তদের কাছে মাতৃভাবের স্নেহশীল আশ্রয়। এই মাতৃভাবের আশ্রয় দেওয়ার জন্যই কুঠিবাড়ির ছাদ থেকে ভক্তদের আহ্বানে তাঁর আকুল কান্না। শ্রীমা এটি যথার্থ বুঝেছিলেন বলেই বলেছিলেন, ‘‘জান তো, ঠাকুরের সকলের প্রতি মাতৃভাব ছিল, সেই মাতৃভাব বিকাশের জন্য এবারে আমাকে রেখে গেছেন।’’ শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন গোপালের মায়ের আসার মুখে ভাবে গোপালের মতো নাড়ু হাতে হামাগুড়ি দেওয়া গোপালমূর্তিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছেন এবং কারও চোখে তা বিসদৃশ ঠেকছে না, সেইরকম নব্যযুবক রাখালকে নিয়ে বাৎসল্যে যশোদার মতো কোলে করে বসছেন, সেটিও কারও চোখে বিসদৃশ লাগছে না। লীলাপ্রসঙ্গকার বলছেন, ভাবে কোনওরকম খাদ না থাকলে তাকে মেকি মনে হওয়ার কোনও সুযোগই থাকে না। সেই মাতৃভাবের আকর্ষণই বর্তমানে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মূল ভিত্তি। এ-ভিত্তি সুদৃঢ় করে গেছেন শ্রীমা ও তাঁর পরম্পরাশ্রিত মহাপুরুষেরা।

এই পরম্পরাকে অনুসরণ করলে আমরা এর বিকাশকে একটু ধরতে পারব। এই বিকাশের মূল হোতা শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে আমরা সবাই জানি। তবু তার বিশেষ দিকগুলি বিশ্লেষণ করলে এক অনন্যতা পাই যা আমরা আগে কখনও শুনিওনি। মাতৃভাবের মাতৃস্নেহ যে-শরীরী স্পর্শ, আদর ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মানুষকে সিক্ত করে, এখানে তার একান্ত অভাব। জয়রামবাটী না যেতে পারলে তাঁর মুখই দেখা যায় না, স্পর্শ তো অসম্ভব। তবু ভক্তমাত্রেরই এক অভূতপূর্ব স্নেহাদরের অনুভব হয় এবং তাঁদের বলতে শুনি যে, এরকম ভালবাসা নিজের মা-ও বাসতে পারেন না। আসলে মা সন্তানকে ভালবেসে আনন্দ পান, সন্তানও তাই মায়ের কোলে মুখ গুঁজে, জড়িয়ে ধরে আদর খাওয়ার আনন্দ পায়। স্পর্শসুখে বাৎসল্যের আনন্দ ব্যক্তিনির্ভর ও তার ওপরেই সীমিত। কারণ সেই মা কারও কন্যা, স্ত্রী, কারও দিদি, মাসি, পিসি ইত্যাদি বিভিন্ন সম্পর্কে জড়িত। তাই প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার এক-একরকম। শ্রীমা-ও সংসারে নানা মানুষের সঙ্গে নানা সম্পর্কে সম্পর্কিত। তা হলেও সবার সঙ্গে তাঁর ব্যবহার জননীর মতো। ।৪১।

এমনকী 'ঠাকুরকে কীভাবে দেখেন' এই প্রশ্নের উত্তরে অবলীলায় বলে দেন—সন্তানভাবে। এই যে গণ্ডিভাঙা মাতৃত্ব, যা দেশ-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে সমগ্র জগতকে স্নেহের বাঁধনে বাঁধে, তার সীমা আমাদের সীমিত মন ধরতে পারে না। ঠাকুরের কথায়, একসের ঘটিতে কি চারসের দুধ ধরে! তাই সে-অনুভবকে প্রকাশ করতে আমরা রুদ্ধবাক হই। মায়ের হাত ধরে মাতৃভাবের সেই বিকাশ সঙ্ঘপরম্পরায় বিধৃত।

মায়ের ভারী স্বামী সারদানন্দজীর মধ্যে মায়ের ধৈর্য, শত প্ররোচনাতেও অবিচলিত থাকার ভাব প্রথম থেকেই ছিল। সবাইকে আশ্রয় দেওয়ার ভাব, শতদোষে দোষীকেও করুণার দৃষ্টিতে দেখা, সকলকে সেবা করার স্বাভাবিক প্রবণতা তাঁর মধ্যে মাতৃভাবের বিরল স্ফুরণ ঘটিয়েছিল। এটি পরিপক্কতা লাভ করে মায়ের স্থূলদেহ চলে গেলে। মায়ের বিশাল সংসার; তাঁর কলকাতা ও জয়রামবাটীর অসহায় স্ত্রীভক্তেরা মাতৃহারা হওয়ার দুঃখ তেমনভাবে ভোগ করেননি। সারদানন্দজী বলতেন, মা দেহে থাকলে তাঁদের সঙ্গে যা করতেন সেটিই তিনি চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। ভক্তেরা তাঁর মধ্যে শ্রীমাকেই পেতেন; যুক্তিবিচার করে নয়, অনুভবে। সে-অনুভব রূপ ধারণ করত। পূজনীয়া সরলা দেবী শ্রীমার দেহত্যাগের পর একদিন উদ্বোধনে গিয়ে সারদানন্দজীর ঘরে ঢুকে শ্রীমাকে বসে থাকতে দেখেন। ভীষণ বিচলিত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার ঢুকে মহারাজকে দেখতে পান। বুঝতে পারেন যে মা উদ্বোধন ছেড়ে যাননি, শরৎ মহারাজের শরীর অবলম্বন করে আছেন। স্ত্রীভক্তেরা মহারাজকে মা হিসাবেই দেখতেন ও অসংকোচে কথাবার্তা বলতেন। এই মাতৃত্ব শুধু স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সব ভক্তদের ক্ষেত্রেই নয়, যাঁরাই উপেক্ষিত, অবাঞ্ছিত, অনাদৃত তাঁদের সকলের জন্য তাঁর দ্বার খোলা, আর তাঁরাও সে-আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করতেন।

স্বামী সারদেশানন্দজী স্মৃতিচারণ করেছেন, একসময় তিনি চিকিৎসার জন্য উদ্বোধনে আছেন। এক ব্রহ্মচারী ধনীর সন্তান। তিনি মঠের আর্থিক অনটন ও অভাবের খাওয়া মানিয়ে নিতে পারেন না। প্রায়ই তিনি ভক্তদের বাড়িতে আহার সারেন। মঠ থেকে তাঁকে অনেকবার নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে শোধরাতে পারেননি। মঠ কর্তৃপক্ষ তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কিন্তু সারদানন্দজীর অনুমতি দরকার। তাই কয়েকজন মিলে তাঁকে ধরে মহারাজের কাছে নিয়ে এসেছেন। মহারাজ সব শুনে এত বিচলিত বোধ করতে লাগলেন যে সারদেশানন্দজী অবাক। তিনি অত্যন্ত করুণস্বরে বলতে লাগলেন, ''আহা, এই আশ্রয় ছেড়ে কোথায় যাবে, কোথায় জ্বলতে পুড়তে যাবে! তুমি আমার কাছে থাক, তোমার যা দরকার হয় আমি দেব। কোথাও যেতে হবে না।'' সারদেশানন্দজী ভাবলেন, সাধু হতে এসে এরকম অদোষদর্শী মানুষের আশ্রয় পাওয়া অতুল ভাগ্যের ব্যাপার। তাঁরই ছাঁচে গড়া তাঁর সন্তান ভূতেশানন্দজীর ক্ষেত্রেও এমন ঘটনা আছে। বিরল মাতৃভাবের এ এক অবগাহনযোগ্য স্নেহধারা। বিয়াত্রিচ কুক ছিলেন সারদানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য। তিনি লিখেছেন ''I always call Sri Guru maharaj Mother—it seems to be my natural cry—He could not hide from me।'' সারদানন্দজী তাঁকে পাঁচ খণ্ড লীলাপ্রসঙ্গ উপহার দিয়ে তাতে 'মা' বলে সই করেছিলেন। ভূতেশানন্দজী বলেছেন, ''আমাদের মনে হত—

।৪২।

যেন মা-ই রূপান্তর নিয়ে বসে আছেন। ঠিক মা! পুরোপুরি মা! তাই বাইরের গাম্ভীর্যের আবরণ আমাদের এতটুকু ভয়ের উদ্রেক করতে পারত না।''

পার্ষদেরা ও তাঁর সন্তানদেরও কেউ আজ শরীরে নেই। তবে তাঁদের সঙ্গ করা মানুষজন অনেকেই আছেন। এই মাতৃভাবের অগ্রগণ্য সন্ন্যাসী স্বামী ভূতেশানন্দজীর কথা তাঁর স্নেহসিক্ত সাধু-ভক্তদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁদের মুখচোখ এক অদ্ভুত কোমলতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। স্মৃতির সে-আনন্দোজ্জ্বল মুখশ্রী শ্রোতাকে সেই মানুষটির সঙ্গসুখের আভাস দিয়ে যায়। এ আবেগপ্রবণ বক্তব্য নয়, এটি অনেকেরই অনুভব। মানুষের নিজ গর্ভধারিণীর সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতা তাকে মাতৃমুখী করে এবং সে-গভীরতা অতলান্ত হলে তা মাতৃভাবের বীজ বপন করে। ভূতেশানন্দজী নিজের মায়ের কথা বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হতেন। ছোট্ট কথায় বলতেন, ''মাকে ভীষণ ভালবাসতুম।'' এটির উচ্চারণেই শ্রোতার কানে তার গভীরতা প্রকাশ পেত। বলতেন, ''জান আমি মায়ের পছন্দ করা ছেলে ছিলুম। একরাতে মা স্বপ্ন দেখলেন যে শিবঠাকুর তিনটি ছেলেকে নিয়ে তাঁর কাছে বলছেন যে তিনি কোন ছেলেটি চান। দুটি ছেলে খুব সুন্দর আর একটি দেখতে ভাল নয়। মা ভাবলেন যদি সুন্দর ছেলে তাঁর কোলে না সয়, তাই খারাপ দেখতে ছেলেটিকে নিলেন।'' কথাগুলি বলার সময় তাঁর মুখ অদ্ভুত এক শিশুসুলভ সারল্যে ভরে যেত। কতবার তাঁর কলকাতা থেকে নিজের গ্রামে মায়ের কাছে ফিরে যাওয়ার গল্প করেছেন। একবার বর্ধমানে নেমে দামোদর পার হয়ে সন্ধ্যে হয়ে গেল। স্কুলে পড়া ছেলে, কী করবেন? একজনের

পরামর্শে তিনি ডাকহরকরার সঙ্গ ধরলেন। এরকম পরপর তিনজন ডাকহরকরার সঙ্গে চলে আঠারো মাইল দূরে যখন গ্রামে পৌঁছলেন তখন অনেক রাত। মা বাইরের দরজায় রাস্তার দিকে তাকিয়ে সন্তানের অপেক্ষায়। ছেলেকে জড়িয়ে ধরে ঘরে নিয়ে যাওয়ার সে-বর্ণনা যেন দৃশ্য হয়ে শ্রোতার চোখে ভেসে উঠত। কিশোরবেলা থেকেই তাঁর উদাসীনতা লক্ষ করে বাবা তাঁকে পড়াশোনা ছাড়িয়ে কলকাতা থেকে গ্রামে পাঠিয়ে দেন, কারণ নইলে সে সাধু হয়ে যাবে। কিন্তু মা প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, ''হোক সাধু, তা বলে ব্রাহ্মণের ছেলে মূর্খ হয়ে থাকবে নাকি!'' এই মায়েরই কলকাতায় যখন শরীর চলে যাচ্ছে তখন তিনি জ্ঞান মহারাজের এক আশ্রমে থাকেন। মুষ্টিভিক্ষায় বেরিয়েছেন, এমন সময় একজন খবর দিল যে তাঁর মা মৃত্যুশয্যায় । ছুটলেন বাড়ি, গিয়ে দেখলেন মায়ের অন্তিম অবস্থা। তীব্র আবেগ দমন করে মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''মা, ঠাকুরকে মনে আছে তো?'' মা ক্ষীণস্বরে বললেন, ''ইষ্টমন্ত্র মনে আছে বাবা।'' মহারাজ বলতেন, ''মাকে তো এত ভালবাসতুম কিন্তু প্রবল শক্তিতে তাঁর মৃত্যুশোক চেপে রেখেছিলুম, এক ফোঁটা

।৪৩।

চোখের জল বেরোতে দিইনি।'' আমাদের মনে হয় মাতাপুত্রের ভালবাসার তীব্রতা শোকাচ্ছ্বাসের আবেগে না বেরিয়ে গিয়ে হৃদয়ের গভীর প্রদেশে ঢুকে মাতৃভাবের এক স্বাভাবিক উৎসের সৃষ্টি করেছিল। পরে সে-মাতৃভাবের বন্যায় ভেসে গেছেন কতজন তার হিসেব নেই। তাঁর মধ্যে গভীর মাতৃভাবকে অনুভব করে অনেকে তাঁকে অক্লেশে মা বলে ডাকতেন; মহারাজও তাঁদের ভাব ভঙ্গ করেননি।

স্বামী গম্ভীরানন্দজী সাধারণ সম্পাদক ও ভূতেশানন্দজী সহকারী সম্পাদক, এই দুজনের সংযোগ মঠ পরিচালনায় এক বিশেষত্বের নিদর্শন রূপে ইতিহাস হয়ে আছে। আপাতকঠোর গম্ভীরানন্দজী ও স্নেহশীল ভূতেশানন্দজীর পিতা-মাতার মতো কঠোরে কোমলে শাসন স্মরণযোগ্য। বুঝিয়ে বলে স্বমতে আনতে তাঁর জুড়ি ছিল না, কারণ স্নেহের বশ সকলেই। অবশ্যই বোঝানোর ব্যাপারে তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে কাজ করত। চিদাত্মানন্দজী বা অলোপী মহারাজ ছিলেন অপর সহকারী সম্পাদক। এই দুই সহকারী সম্পাদকের অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব ছিল। তাঁদের খাওয়া, ওঠাবসা সব একসঙ্গে চলত। তবে ভূতেশানন্দজীর বন্ধুত্ব অলোপী মহারাজের কাছে সব-ভুলিয়ে-দেওয়া আশ্রয়ের মতো ছিল। অলোপী মহারাজ তখন অসুস্থ, শয্যাশায়ী। ভূতেশানন্দজী তাঁকে দেখতে গেলে অলোপী মহারাজের চোখ দিয়ে কেবল জল পড়ে; বলেন, ''আর এ-শরীর দিয়ে ঠাকুরের কাজ হল না।'' মহারাজ তাঁর হাতটি নিজের হাতে নিয়ে বলেন, ''শরৎ মহারাজের কথা মনে আছে তো, যা তিনি মহাসম্মেলনে বলেছিলেন? 'It is a privilege to be an instrument in the hands of God but it is also a privilege being set aside।' '' অলোপী মহারাজ সেকথা শুনে বিষাদ থেকে মুক্ত হয়ে এত আনন্দ পেয়েছিলেন যে যিনিই দেখতে আসতেন তাঁকে ভূতেশানন্দজীর কথাটি বলে আনন্দ করতেন।

পরে যখন ভূতেশানন্দজী মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ, কাঁকুড়গাছিতে থাকেন, তখন থেকেই মাতৃভাবের প্রকাশ তাঁর মধ্যে এক বিশেষ মাত্রা লাভ করেছিল। পরিচিত কেউ প্রণাম করলে তিনি তাঁর মাথাটি কোলে টেনে নিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে, মাথার চুলে বিলি কেটে এমন আদর দিতেন যে মানুষটি অভিভূত হয়ে যেতেন। পরিচালন ব্যবস্থায় উচ্চপদে অধিষ্ঠিত সন্ন্যাসীরাও তাঁর কাছে এই আদর পেয়ে শিশুর মতো হয়ে যেতেন। একজন তো একবার বলেই বসলেন যে, তিনি মঠের ঠাকুমা হয়ে বসে আছেন, কারও দোষ দেখেন না, আদর করে তাদের আস্কারা দিচ্ছেন। কিন্তু এই স্নেহাদরের আস্কারাই মানুষকে নিজের ভুল বুঝতে সাহায্য করত। কাউকে বকেন না কেন বললে বলতেন, ''কী জানি বাপু, লাঠি উঁচিয়ে শাসন আমার দ্বারা হয় না।''

সারদানন্দজীর বকুনির নিম্নতম শব্দটি ছিল বাঁদর। ভূতেশানন্দজী সে-শব্দটিও ব্যবহারের প্রয়োজন কখনও বোধ করেননি। প্রয়োজনও হত না, কারণ তাঁকে দুঃখিত দেখলে দোষীর প্রাণ আপনিই অনুতাপে ভরে উঠত। সেবকেরা কেউ বিরক্তি প্রকাশ করলে তিনি চুপ করে যেতেন, কিন্তু সেবকের মনে ঝড় বইত। একবার এক সেবক কোনও কারণে বিরক্তিতে বলে ওঠেন যে তিনি আর তাঁর চিঠি লিখতে পারবেন না, তিনি যেন অপর কাউকে জোগাড় করে নেন। মহারাজ অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন, ''আমি

অন্য লোক কোথায় পাব!'' সেবক বললেন তা তিনি জানেন না। কিন্তু সেবকের সাধুর হৃদয়; তাৎক্ষণিক ক্ষোভপ্রকাশের অপরাধবোধ তাঁকে কুরে কুরে খেতে লাগল। মহারাজ তাঁকে কাছে ডেকে নিজস্ব ভঙ্গিমায় আদর করাতে চোখের জলে ভেসে তিনি আকুল। মনে হয়েছিল, এর চেয়ে তীব্র বকুনি বোধহয় ভাল ছিল। কিন্তু এই ঘটনার শিক্ষা হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছিল। তাঁর আনন্দময় হাসিমুখটি সকলের কাছেই সমান আকর্ষণীয় ছিল। সেটি গম্ভীর দেখলে মায়ের কাছে সন্তানের যেমন হয়, তেমনই ভক্তের প্রাণ আশ্রয়হীনতার ভয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠত। এই ভাবটি মনুষ্যেতর প্রাণীরাও অনুভব করত। ঘনিষ্ঠ ভক্তেরা তাঁর ঘরে ঢুকে প্রণাম করতে গেলে তাঁর পায়ের পেছনে চেয়ারের তলায় একটি বেড়ালকে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দেখতেন। অবাক হলে মহারাজ বলতেন, ''ও জানে এই স্থানটিতে ওকে কেউ বিরক্ত করবে না।'' ভক্তেরা এটি তাঁদের ভাবনার প্রতীক হিসাবে দেখে আনন্দ পেতেন। অর্থাৎ তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করলে ওই নিশ্চিন্ততার প্রাপ্তি নিশ্চিত। মহারাজ আসছেন, রাস্তার মাঝখানে এক কুকুর শুয়ে আছে। এক ভক্ত তাকে সরাতে পায়ে করে সামান্য ঠেলে দিলেন, আর কুকুরটি লাফিয়ে চলে গেল। মহারাজ দুঃখিত মুখে বললেন, ''ওকে মারলে কেন?'' সামান্য হলেও তাকে আঘাত করে সরানোর কোনও দরকার নেই কারণ তাকে পাশ কাটিয়ে যেতে তাঁর কোনও অসুবিধে নেই। কারও অসুবিধে করা তো নয়ই, প্রয়োজনে তাকে সাহায্য করাই তাঁর ভাব। বাঁকুড়া মঠে এক দুপুরের শেষদিকে তিনি ঘরে চেয়ারে বসে। দরজার কাছে এক ভক্ত দেখলেন একজন মানুষ, খালি গা, কোমরে যৎসামান্য কাপড়, বারান্দা পেরিয়ে ঘরে ঢোকার উদ্যোগ নিচ্ছে। ভক্ত বলে উঠলেন, ''কোথায় যাচ্ছ?'' মহারাজ ভেতর থেকে বলে উঠলেন, ''ওকে তাড়িয়ে দিচ্ছ কেন?'' মহারাজ তার সঙ্গে কথা বলে তাকে দীক্ষার অনুমতি দিলেন। এই শিক্ষাটি সম্বন্ধে তিনি বলতেন : মঠে প্রথমদিকে কাঁঠালতলার সামনেটি বেড়া দেওয়া ও একটি বাঁশের দরজা ছিল। একদিন তিনি মাঠ পেরিয়ে মঠবাড়িতে ওই বাঁশের দরজাটি ঠেলে ঢোকার আগে দেখলেন পেছন পেছন এক পাগল ঘাড়ে এক বড় পুঁটুলি নিয়ে আসছে। তিনি ঢুকে পড়ে দরজাটি আবার ঠেলে দিলেন। এদিকে সেই পাগল বোঝা নিয়ে কিছুতেই দরজা পেরোতে পারছে না। ওপরে বারান্দায় অখণ্ডানন্দজী দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, "ওকে সাহায্য না করেই তুমি চলে এলে?'' ভূতেশানন্দজী লজ্জিত হয়ে সেটি খুলে ধরলেন। মহারাজ তাঁর জীবনের ত্রুটিমুক্তির ঘটনাগুলি বলে ভক্তদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন। তাঁর সঙ্গে একটা অতি নিকট সম্বন্ধ বোধ করতেন ভক্তমাত্রই। ভক্তেরা মহারাজের কাছে প্রণাম করে অনেক সমস্যার কথা বলতেন। বেশিরভাগ সময়েই তা সাংসারিক তুচ্ছ কথা বলে অনেকেরই মনে হত। কিন্তু মহারাজ তা অতি মনোযোগ সহকারে শুনতেন। বস্তুত ওই শোনার জন্যই হয়তো বক্তার মনের ভার বেশ হালকা হয়ে যেত। তুচ্ছতার বোধ এক-একজনের কাছে এক-একরকম, কিন্তু দুঃখ-বেদনার তো রকমফের নেই। তাই মহারাজ মায়ের মতো তার দুঃখের কথা আন্তরিকভাবে শুনে নিজে দুঃখিত হতেন আর সে-দুঃখ ভাগ করে দিতে পেরে দুঃখী মানুষটি অনেক স্বস্তি পেতেন।

এই মাতৃভাবের প্রকাশের সঙ্গে সেবকেরা বাৎসল্যভাবও অনুভব করতেন। দুপুরে খাওয়া [৪৫]

হলে মহারাজ একটু বসতেন। খানিক বসে থাকার পর তাঁকে শুইয়ে দিয়ে যখন সেবক বলতেন, ''এবার ঘুমিয়ে পড়ুন'', মহারাজ বলতেন, ''একটু পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে দাও, ঘুমোচ্ছি।'' শিশুসুলভ সে-আবদারে সাড়া দেওয়া ছিল সেবকের অমূল্য প্রাপ্তি। মহারাজ চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। উঠে বসাবার জন্য সেবক মাথাটি নিচু করে তাঁর বুকের কাছে নিয়ে যেতেন যাতে তিনি সেবকের কাঁধে ভর দিয়ে উঠে বসেন। তার বদলে প্রায়ই সেবকের মাথাটি নিজের বুকে চেপে ধরতেন মহারাজ। সেবক আপত্তি করতেন, ''ছাড়ুন ঘাম লেগে যাবে বুকে,'' কিন্তু তিনি ছাড়তেন না, তবে তাঁর স্নেহঝরা এই আদরটি সেবকের মর্মে গেঁথে যেত। সকালে প্রাতরাশের সময় ফল দেওয়া হত। শিশুর মতো সেগুলি গুনে পাশে থাকা ভক্তকে হয়তো বললেন, ''দেখো আজ এত রকমের ফল।'' আবার কোনও কারণে চামচে করে তুলতে গিয়ে যদি টেবিলের নিচে এক টুকরো পড়ে যেত তো উঁকি মেরে দেখে সেটি তোলবার উদ্যোগ নিতেন। সেবক সতর্ক, তিনি ওটি তুলে নিয়ে ফেলে দিতেন। মহারাজ তখন ছেলেমানুষের মতো বলবেন, ''আমার একটা কম হয়ে গেল।''

এই সামান্য ঘটনাগুলি সেবকের মনে অপূর্ব বাৎসল্যরসের সৃষ্টি করত। এক সেবক তো তাঁকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে আদর করতেন। মহারাজের চোখে তখন শিশুর আহ্লাদ। তাঁর মধ্যে এই শিশুসুলভ ব্যবহার, আবার মাতৃস্নেহে আদর ও আশ্বাস দান এবং আধিকারিক পুরুষের সৌম্য গাম্ভীর্য, এ-তিনটিই পর্যায়ক্রমে তাঁর মধ্যে ঘনিষ্ঠেরা দেখতে পেতেন।

।৪৬।

সঙ্ঘের প্রতি তাঁর আনুগত্য তাঁকে প্রায় সঙ্ঘস্বরূপ করে তুলেছিল। সাধু-ভক্ত নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমদৃষ্টি ছিল তাঁর। নাগপুরে রাতে খাওয়ার পর সাধু ও ভক্তদের সভায় মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিচারণ করে আবেগভরে বলেছিলেন, ''তাঁরা আমাদের যে স্নেহ, ভালবাসা দিয়েছেন তা হয়তো আমরা তোমাদের দিতে পারি না। কিন্তু জানবে আইনকানুন করে সঙ্ঘ চালানো যায় না। পারস্পরিক ভালবাসাই সকলকে বেঁধে রাখে।'' কাঁকুড়গাছিতে স্থানাভাব, সাধুরা কেউ এলে থাকার ব্যবস্থা করতে অসুবিধে হয়, তাই একটি বাড়ি হচ্ছে। একজন ইঞ্জিনীয়ার সাধু সেটি দেখাশোনা করছেন। এক সকালে তিনি বাজারে গেছেন কাঠ কিনতে কিন্তু রাতে খাওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁর খবর নেই। খাওয়ার পর মহারাজ যখন জানলেন যে তিনি ফেরেননি, তখন ক্ষোভের সুরে বললেন, ''কেউ তোমরা তার খবরও নিলে না, এ কীরকম ব্যাপার!'' মোবাইলের যুগ সেটা নয়, তাই স্বাভাবিক উত্তর এল যে তাঁরই ফোনে একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু দেননি। মহারাজ উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, ''সেটা একটা কারণ হল?'' এই কথাবার্তার মধ্যেই লরি বোঝাই কাঠের প্রবেশ ঘটল আশ্রমে। মহারাজ ভাণ্ডারীকে বললেন ''যাও, দেখো তার খাবার রাখা আছে কী না।'' ভাণ্ডারী দেখে এসে বললেন, ''সব সাজিয়ে রাখা আছে।'' মহারাজ খুব দুঃখিত মুখে বললেন, ''সাজিয়ে রাখা আছে বললে হয়? খাবার সময় একটু কাছে থাকবে না? এটুকুও না করলে তোমাদের মধ্যে ভালবাসা বাড়বে কী করে?''

সংসারের শত ঝামেলায় পিষ্ট স্নেহপিয়াসি মায়েরা মহারাজের কাছে আসার জন্য ছটফট করতেন। মহারাজও সকলকে নিয়ে তাঁর প্রণামের ঘরে বসতেন। কাঁকুড়গাছিতে তো ছিলই সে

ব্যবস্থাটি, বেলুড় মঠে এসেও সেটি চলতে থাকে। দরজা খুললেই হুড়মুড় করে মায়েরা ঘরে ঢুকে মহারাজের কাছে বসার জন্য প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। মহারাজ যদি দেখতেন, দূর থেকে অনেকদিন পরে এসেছে এমন এক ভক্ত মেয়ে দূরে বসে আছেন, তখন তিনি পরিচিত কোনও ভক্তকে বলতেন তার জায়গাটি সেই মেয়েটিকে দিতে। তখন আবার মহারাজের কথায় অনেকেই জায়গা দিতে রাজি হতেন। এই সময়টুকুর জন্য মায়েদের কতদূর থেকে কত কষ্ট করে কিছু না কিছু হাতে বয়ে নিয়ে আসতে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই এই আকর্ষণী শক্তির কথা ভেবে অবাক হয়েছেন।

ঘণ্টাখানেক বাদে যখন সেবক মহারাজ বলতেন, ''মহারাজ, এবার ওদের হাত দেখিয়ে দিন'' অর্থাৎ প্রণামের সময় শেষ, তখন দুপক্ষই অতিকষ্টে সে-ব্যবস্থা মেনে নিতেন। আবার কখনও মহারাজ করুণস্বরে একটু বাড়তি সময়ের আর্জি জানাতেন সেবকদের কাছে। একবার মহারাজ কাশীতে আছেন অম্বিকাধামে। মে মাস, খুব গরম। যে-ভক্তটি মহারাজের কাছে ছিলেন তাঁকে সেবকেরা নির্দেশ দিয়েছেন, দুপুরে যেন মহারাজ শুয়ে থাকেন, না বের হন। ভক্তটির চোখ লেগে গেছে, এমন সময় খুট করে আওয়াজে সতর্ক হয়ে দেখেন মহারাজ উঠে নিঃশব্দে ঘরের খিলটি খোলার চেষ্টা করছেন। ভক্তটি সেবকের নির্দেশ জানালে মহারাজ বাইরে গরমে অশ্বত্থগাছের ছায়ায় অপেক্ষমাণ মায়েদের দেখিয়ে বলছেন, ''ওদের

l৪৭l

দেখে তোমার কষ্ট হচ্ছে না?'' তাঁর ভালবাসারই জয় হল। সেই পড়ন্ত বেলাতে মহারাজ বেরিয়েছেন দেখে সকলে আনন্দে ছুটে এসে ঘরের বারান্দায় বসে পড়লেন। এ-ভালবাসার টানের গভীরতা মাপার যন্ত্র আমাদের নেই। শেষদিকে যখন ভক্তদের তাঁর কাছে বসা বন্ধ হয়ে গেল, তখন তিনি ভক্তবিরহের বিষাদ অনুভব করতেন। মা যেমন সন্তানকে খানিক না দেখতে পেলে অধীর হন, মহারাজেরও তখন সেইরকম অবস্থা। সন্তানদেরও অনেকদিন বাদে মাকে পেলে যেমন হয়, তেমন আনন্দের প্রকাশ ঘটত তাঁকে পেয়ে।

ঋতানন্দজী তাঁর স্মৃতি থেকে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একজন ট্রাস্টি সন্ন্যাসী এসেছেন ভিন্ন প্রদেশ থেকে ট্রাস্টি মিটিং-এর জন্য। সেই মিটিং-এ কয়েকজন সাধুকে মঠে না রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। দুদিন বাদে সেই সন্ন্যাসী ফিরে যাওয়ার আগে মহারাজকে প্রণাম করতে এলেন। মহারাজ বিষাদমাখা গম্ভীর গলায় বলতে থাকলেন—''আইনমতো কাউকে আমরা বার করে দিতে পারি, কিন্তু ভেবে দেখার সময় এসেছে যে কেন আমরা তাকে ভালবেসে ধরে রাখতে পারছি না। কেন তার ভালটুকু কাজে লাগাতে পারছি না। মানুষ তো ভালবেসেই ঠাকুরের আশ্রয়ে আসে, তাহলে তার সেই ভালবাসাটুকু যাতে বজায় থাকে তা কেন করতে পারছি না। আমরা কেউ কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি যে আমাদের কোনও দোষ নেই? জানবে সন্ন্যাসী কেউ হতে পারে না, ঠাকুরই সন্ন্যাসী করে সঙ্ঘে রাখেন, তাই সে সঙ্ঘে থাকতে পারে।'' উপস্থিত সাধুরা সে-বিষাদভরা আক্ষেপের স্বরে স্তব্ধ।

কারও চলে যাওয়া তাঁকে ভীষণ ব্যথিত করত। স্বামী চেতনানন্দজী বলছেন, একবার আমেরিকা ফিরে যাওয়ার প্লেন খুব ভোরে, তাই আগের রাতে মহারাজকে প্রণাম করে বললেন, ''এটি বিদায়ী প্রণাম, কাল ফিরে যাচ্ছি।'' শুনেই মহারাজ বললেন ''কীসের বিদায়! তুমি কোথায় যাবে, আমাদের কাছেই তো থাকবে। এখানে আসন আছে যাওন নেই।'' সত্যিই তাঁর কাছে আসা যেত এবং সে 'আসন' একবার হলে আগতের হৃদয়ে তাঁর আসন পাতা হয়ে যেত, সেখান থেকে কারওরই 'যাওন' সম্ভব ছিল না। এক সাধু গৃহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় শ্রীমা বলেছিলেন—তুমি আমার সন্তান যেমন ছিলে তেমনই থাকবে, কিন্তু সন্ন্যাসিসঙ্ঘে তোমার ঠাঁই হবে না। মা ও সন্তানের সেদিনের সেই অশ্রুসজল বিদায় মাতৃভাবের এক নিদর্শন হয়ে আছে। ''দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে/ সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।''

বেলুড় মঠের অতবড় প্রান্তর লোকে লোকারণ্য অথচ নীরব। গভীর বিষাদে আকাশ বাতাস ছেয়ে আছে। সাধুরা নতমুখ, ভক্তেরা অশ্রুসজল চোখে তাদের প্রাণের আশাভরসাকে বিদায় জানাচ্ছে। অগ্নিতে আহুত নশ্বর শরীরের ধূম উঁচুতে উঠে বেলুড় মঠের আকাশে পাক খেয়ে গঙ্গাবক্ষে মিলিয়ে যাচ্ছে। যে-মাতৃভাবের স্বাদ কিছু মানুষের চির আনন্দের কারণ হয়ে উঠেছিল তা যেন চরাচরে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে আকাশ থেকে বৃষ্টি নেমে এসে এ-ধরণীর শোকাশ্রুতে মিশে যাচ্ছে। তাঁর আনন্দময় মুখটির হাসি, স্নেহভরা কণ্ঠস্বর ভক্তদের প্রাণের গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করছে। শ্রীশ্রীয়ের মন্দিরে বসে ছিলেন ভাবাতীতানন্দজী, বিজ্ঞানানন্দজীর আশ্রিত। পাশের শোকস্তব্ধ ভক্তটিকে ধরাগলায় বললেন, ''আমি আটজন প্রেসিডেন্টকে দেখেছি। কিন্তু এরকম দেখিনি।'' নি

।৪৮।